OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 883 - 890
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার রচনায় সমাজ ভাবনা

দেবী মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া
Email ID : debibeng22@klyuniv.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Meghnad Saha, Bengali scientist, state-owned industry, industrial policy, science and religion, regime reform, refugee rehabilitation, river dam project.

Abstract

Meghnad Saha (1893-1956) is a prominent Bengali scientist and science-literary of the twentieth century. He is called the 'Father' of modern astronomy and the grandfather of Indian science culture. Born in rural Bengal, this scientist was not only astronomer; he was an educator and social thinker. Standing in the subordinate India, he gave various philanthropic messages for the society and the nation, which are significant literary signs about social science thinking published in literature. Such as 'ways of national development', 'Poverty and unemployment problems in India', 'Industrial policy of Government of India', 'science and religion', 'state-owned Industry'. Through these works, he advised the Bengali nation to be self-reliant as a national development as a means of national improvement, and on the other hand, the Indian government said that various types of new industries on the industrial policy of the Indian government, through which the poverty and unemployment problems of India, think that it will be possible to eliminate India. At the same time, he said that the elimination of illiteracy and the inevitable spread of science technology. Because in the age of modern technology, the key to civilization is science.

So he sought the help of poets to make science heartbreak. Scientists are truth seekers, but their language lacks expression. In this case, poetry is complementary to science. Not only art, society or literature, Meghnad Saha thought was a combined form of science and religion. He believed that if religion was used in a scientific way by freeing superstition, it would be more effective than medicine. And religion can unite people, nature and society. Entering the world of politics, he has taken various social welfare steps. The establishment of the 'River Research Institute' for the construction of a dam on the flood-hit river from the rehabilitation of refugees- his social thoughts are reflected everywhere. And the compositions of the above topics are the main discussion of this article on scientific-social science thinking.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কর্মবীর মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) আধুনিক ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎই কেবল ছিলেন না, তাঁকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসংস্কৃতির 'পিতামহ' বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানের সব জটিল তত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বমহলে বন্দিত হলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশী। তাঁর কর্মযজ্ঞের তালিকায় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণার পাশাপাশি দেশীয় সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। তিনি যেমন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী ছিলেন, তেমনই ছিলেন দেশ ও দশের কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ। সমাজ সচেতন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী মেঘনাথ সাহা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহে বড় হয়ে উঠেছেন। স্কুল জীবনেই যোগ দিয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা ছোটবেলাতেই তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছিল। বিজ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প গ্রহণের দ্বারা দেশের জাতীয় উন্নতির সাধনায় মগ্ন থেকেছেন আজীবন। বিজ্ঞানকে জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন দেশের সেবাই করে গেছেন। আর তাঁর এই প্রয়াসই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে - যা বৈজ্ঞানিক-প্রাবন্ধিকের সমাজ বিজ্ঞান ভাবনা বিষয়ে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

কর্মময় প্রাণশক্তির অধিকারী মেঘনাথ সাহা কর্মযোগের দীক্ষায় বারংবার বিভিন্নভাবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর জীবনযাত্রার পথ কোনো কালেই পুষ্পবেষ্টিত ছিলনা। ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার নিকটস্থ শ্যাওড়াতলি গ্রামে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে পঞ্চম সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন বিশ শতকের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। পিতা জগন্নাথ সাহা ছিলেন একজন সামান্য ব্যবসায়ী, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী গৃহবধূ। বাড়িতে লেখাপড়ার বিশেষ চল ছিল না বললেই চলে। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মেঘনাদ সাহার অসাধারণ প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে বাল্যকাল থেকেই। কাজেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং বড়দাদা জয়নাথের অনুরোধে তিনি মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার অনুমতি পান। গ্রামের স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে ১৯০৫ সালে ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, ফলত বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে আই সি এস পড়ার জন্য এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে তিনি কলেজ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এরপর ১৯১১ সালে কলকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, গণিতাচার্য ডি.এন. মল্লিকের পাশাপাশি সহপাঠী বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর প্রমুখর সাহচর্য লাভের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকেন।

১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মিশ্র গণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এরপর উপাচার্য আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর ক্লান্তিহীন বিজ্ঞানচর্চা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে বিকিরিণ চাপ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য ডিএসসি ডিগ্রির অধিকারী হন এবং ১৯১৯ সালে নক্ষত্রের বর্ণালী সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালে যুগান্তকারী 'তাপীয় আয়নন তত্ত্ব'র উদ্ভাবন ডক্টর সাহারই কৃতিত্ব। বহুবিধ বিজ্ঞানের সাধনায় একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন থাকার দরুণ ১৯২৬-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের সভাপতি নির্বাচিত হন। এমনকি বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি কলকাতায় ১৯৩৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি' এবং ১৯৩৫ সালে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি যে 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠানের স্থাপন করেন, তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৬) পর ওই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'।

নিরলস বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তিনি পূর্ণ উদ্যমে আজীবন সমাজের কল্যাণ বিষয়ক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এই সমাজ কল্যাণের দীক্ষা তিনি লাভ করেছেন রসায়নের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট। তাঁর জীবনের আদর্শ গঠনে আচার্যের ভূমিকা অসীম। বলা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্থক উত্তরসূরী হলেন মেঘনাথ সাহা। তাঁর জীবনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জনসেবার আদর্শের বীজ রোপিত হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে। আচার্য্যের অনুপ্রেরণাতেই মেঘনাথের জীবনে বিজ্ঞান ও দেশ সেবা এক সূত্রে মিলে গেছে। ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যায় ত্রাণ কাজে প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে সামিল হয়ে তিনি প্রথম সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং সার্বিকভাবে সমাজ কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেন। আচার্যের বাণী গুরু মন্ত্রের মত তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাহিত হয়েছে প্রতিনিয়ত - 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না'। ১৯২২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ বন্যা কবলিত অঞ্চলের ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করেন মেঘনাথ সাহা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গৃহহীন উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সালে সামাজিক উন্নতিকল্পে তিনি ভোটে দাঁড়ান এবং নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য মনোনীত হন। মূলত যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিজ্ঞানকে আধার করেই তিনি সমাজের বা দেশের হিতসাধনে এগিয়েছেন।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণা বহির্ভূত রচনাগুলীর অধিকাংশই হল সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক। কিংবা সমাজের উন্নতি সাধনে লেখা বাংলা সাহিত্য বিশেষ। সমাজবিজ্ঞান বলতে মূলত বোঝায় মানব সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ মানবিক আচরণের উন্নতি সাধন- যার সাথে বিজ্ঞান ও ধর্ম একাত্ম হয়ে যায়। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মেঘনাথ সাহার সমাজ-ভাবনামূলক রচনাগুলি হল 'জাতীয় উন্নতির উপায়', 'কাব্য ও বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান ও ধর্ম', 'একটি নূতন জীবন দর্শন', 'ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা', সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ের অন্তর্গত 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প', 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি', 'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' প্রভৃতি। এই রচনাগুলিতে প্রাবন্ধিক সমাজের বিভিন্ন দিকের হিত বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন।

আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী ভাবনায় ভাবিত মেঘনাথ সাহা সমাজের সার্বিক উন্নতির প্রয়াসে সচেষ্ট হলেও মাতৃভাষার বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক ভাবনাগুলি লেখনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ভাষার প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। তদসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় রচিত মুষ্টিমেয় রচনাসকল বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে স্থান করে নিয়েছে আড়ম্বরহীন রচনা কৌশলের জন্য। তাঁর বাংলা রচনাগুলি সুখপাঠ্য - যার মধ্যে একটা সহজতা ও সাবলীলতা বিদ্যমান। অযথা জটিল বিজ্ঞান উপযোগী শব্দ প্রয়োগ করে কিংবা বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকারের দূরূহ শব্দের উল্লেখ করে বাক্যকে পরিশ্রমসাধ্য করে তোলেননি লেখক। বরঞ্চ বিভিন্ন উপমার প্রয়োগে রচনাগুলিকে করেছেন সাহিত্য গুণান্বিত।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মেঘনাদ সাহার প্রথম রচনা 'জাতীয় উন্নতির উপায়'। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নবভারত' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন সংখ্যায়। এই রচনাটি বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যুবক মেঘনাথ সাহার অভিভাষন। রচনাটির পটভূমিকা কেবল নাটকীয় নয়, ঐতিহাসিকও বটে। কেননা সভায় উপবিষ্ট ছিলেন সভার উদ্যোক্তা সুভাষচন্দ্র বসু। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান গবেষণায় মেঘনাথের অবদান তখন বিশ্ব স্বীকৃত। সভার মূল বক্তার আসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি বলেন জাতীয় উন্নতির উপায় নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বারবার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী, যা মেঘনাথ সাহাকে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বস্ত করেছে। আর সেই বার্তায় তিনি দিয়েছেন জাতির প্রাণ যুবশক্তির উদ্দেশ্যে। জাতির উন্নতিকল্পের আলোচনায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রথমেই তিনি একটি পুরাণ কাহিনীর অবতারণ করেছেন- বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামের প্রধান দ্বাররক্ষী ছিল জয় ও বিজয়। কার্যবশত তারা দেবকুমারদের অবমাননা করায় অভিশপ্ত হয়ে মুক্তির উপায় বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তাদের দুটি পথের কথা বলেন। এক, দেবতাদের প্রতি অনুরাগ রেখে সাত জন্ম পর মুক্তি পাওয়া এবং দুই, দেবতাদের প্রতি বিরাগ রেখে তিন জন্ম পর মুক্তি লাভ। তারা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে এবং তারা যথাক্রমে সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হয়ে বরাহ ও নৃসিংহ আবতারের হাতে, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হয়ে রামচন্দ্রের হাতে, দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বধ হয়ে মুক্তিলাভ করে। এই উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তা বা প্রাবন্ধিকের বলার উদ্দেশ্য এই যে, দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠিত শক্তির দয়ার উপর নির্ভর না করে, তার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির ইতিহাসে দেখা যায় প্রকৃতির বিরূপতা। বিশেষত ইউরোপের তিনদিকে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র, প্রচন্ড শীত, অনুর্বর জমি। তা সত্ত্বেও শতাব্দীর সুপ্ত দশা থেকে মানবাত্মা নিদ্রাত্থিত হয়ে প্রথমে জয় করলো সমুদ্রকে। ক্রমে আজ তারা বিশ্বজয়ী। অগাধ জলরাশি ও প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে তাদের জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল ভিত্তি হয়েছে সঙ্গবদ্ধ আত্মনির্ভরতা ও স্বতন্ত্রপ্রিয়তা। অন্যদিকে প্রাচ্যের প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় উদারতা। মানুষের সামান্য প্রচেষ্টায় খুশি হয়ে প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাকে দান করেছে ক্ষুধার উদ্বৃত্ত শস্য। মানুষের অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন না পড়ায় এদের প্রকৃতি হয়েছে কোমল, ঘরমুখো ও নিজস্ব ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ। কাজেই পাশ্চাত্য দেশ তাদের প্রয়োজন মেটাতে প্রাচ্যের দ্বারস্থ হয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রাচ্য তথা ভারতবাসী পরিণত হয়েছে তাদের ক্রীতদাসে। এই দাসত্ব গ্রহণই হলো জাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

কোন জাতির প্রতিভা একদিকে বিকশিত হওয়া চরম অমঙ্গলের বিষয়। তৎকালীন সময়ে এবং বর্তমান সময়েও বাঙালি জাতির মধ্যে দেখা যায় শিক্ষালাভ করে চাকরি করার প্রবণতা। তাদের উচ্চতম লক্ষ্য হল সরকারি চাকরি। এই অংশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি উক্তি স্মরণ করা যায় –

> "কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকুরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল, সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হতে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকুরীর উমেদার; হিন্দু কলেজের ছেলেরা যাঁরা, মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠি, তাঁরা গ্রাজুয়েট হলেই প্রথম Lord Hardinge-এর গভর্ণমেন্ট তাদের ডেকে বড় বড় চাকুরী দিতেন। সেই সময় থেকে মতিগতি যে চাকুরীর দিকে গেল, আর সে ফিরল না। বাংলার ধনে ইংরেজ, মাড়োয়ারীর সিন্দুক বোঝাই হল আর বাংলার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা ডিগ্রী - তাই সিদ্ধি চাকুরী।"[১]

একটা সময় ছিল যখন কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার, হাটখোলার দত্তপরিবার, রানাঘাটের পালচৌধুরীরা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। পরবর্তীকালে কোম্পানির বাণিজ্য শুরু হলে বাঙালিরা ব্যবসা থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং তার জায়গায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার লাভ করল মাড়োয়ারি, ভুটিয়া, পার্সি, ইহুদি প্রভৃতি ব্যবসাদার জাতি। আর বাংলা সন্তানেরা হয়ে গেল তাদের বেতনভুক্ত দাস। প্রাবন্ধিক এই পরবশতা বা পরমুখাপেক্ষিতার জন্য আমাদের প্রকৃত জাতীয় চরিত্রকেই দায়ী করেছেন। আর এই স্বাধীন বৃত্তি বিমুখতা থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্রতা, যা বাংলার প্রধান সমস্যা।

বাংলার প্রধান সমস্যা দূরীকরণের জন্য কিংবা জাতির উন্নতির উপায় হিসেবে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক মহাশয়। সংঘবদ্ধভাবে দেশের সকল বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করে নিজের হস্তগত করতে হবে। বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র বিজ্ঞান। তাই তিনি প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয় লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করতে বলেছেন। বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা যেমন তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, সেই পথেরই অভিযাত্রী হতে হবে বাংলাকে। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে দেশের দারিদ্র্যমোচন করা। ভবিষ্যতে এই দেশের প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের হিতে ব্যবহারের জন্য যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে। কেননা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় - 'সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ হবে না'। মোটকথা জাতীয় উন্নতির উপায়ে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের কথা বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হবে। পরাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বাঙালি জাতিকে স্বনির্ভরতা ও স্বদেশীয় শিল্পের বিকাশে যত্নবান হওয়ার বার্তা দিয়েছেন লেখক। তিনি মনে করতেন দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন দেশ আত্মনির্ভর হবে। তিনি বাঙালি জাতিকে স্বদেশীয় শিল্প উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে অধিক মনোনিবেশ করতে বলেছেন।

'একটি নতুন জীবন দর্শন'-এ লেখকের অনুভূত বিষয় –

> "দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির ওপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাজার বছরের অভিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানরাশীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সভ্যতার শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে নতুন নতুন প্রণালী আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং প্রতিবার নতুনভাবে সমাজ গঠিত হয়েছে। মানুষ তার হাত ও মাথাকে সমানভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সময়ের উপযোগী করে প্রস্তুত করেছে। আমাদের কর্মশক্তি কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান নয়, আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যাবতীয় 'চাবি-শিল্প' (শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, যাতায়াত-রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প) যেমন রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন, চাইলেই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বহির্ভূত হতে পারে না, তেমনি আমাদের দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। দেশকে শিল্প প্রধান করে তার মূলধন রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে –

> "যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"[৩]

মেঘনাথ সাহা তাঁর 'ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণ কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও অভাবজনিত সমস্যা। সেই সঙ্গে আছে বিশাল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু সেই তুলনায় সীমিত উৎপাদন, শিল্প উন্নয়নের অভাব এবং সর্বোপরি অশিক্ষা। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রাবন্ধিক শিল্পায়ন ঘটাতে বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ হবে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারিত হবে। এ ছাড়াও তিনি কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা, কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের নতুন পথ সৃষ্টির কথা বলেছেন তাঁর রচনার মধ্যে।

মেঘনাদ সাহা একজন প্রকৃত কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, চিন্তাবিদ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক তখনই হবে যখন ধর্মকে সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মুক্ত করে বিজ্ঞানচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করা হবে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম এক সময় বিজ্ঞানের প্রতি সহনশীল ও অনুসন্ধিৎসু ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি, আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা এবং কুসংস্কার হিন্দুধর্মকে পশ্চাদপদ করে তোলে। আধুনিক বিজ্ঞান মানবসমাজকে যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তাশীল ও মানবকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার বার্তা দেয়। তাই ধর্মের মধ্যে থেকে অন্ধবিশ্বাস, জাতপাতের বিভেদ, আচারিক বাধানিষেধ ইত্যাদি দূর করে বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক ধর্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। ধর্ম যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশে সহায়ক না হয়, তবে সেটি জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মেঘনাদ সাহার মতে, ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সাথে তথ্য অনুসন্ধান এবং তার দ্বারা পুরাতন ধ্যান-ধারণার নিরসন ঘটিয়ে মানসিক জড়ত্ব দূর করা।

কাব্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে লেখা মেঘনাদ সাহার দুটি প্রবন্ধ হল 'কাব্য ও বিজ্ঞান' এবং 'বিজ্ঞান ও ধর্ম'। এই রচনা দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত। 'কাব্য ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে লেখক বৈজ্ঞানিক যুগের আগ্রাসনে কবি ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কবিরা এমন এক শক্তির অধিকারী যাদের মননে প্রকৃতির গোপন রহস্য সহজেই ধরা দেয়, তারা হলেন সত্যদ্রষ্টা। ভবিষ্যতের সু-সমাচার তাদের বাণীতে ধ্বনিত হয়। কবিরা হন শব্দব্রহ্ম-বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের ইচ্ছা তাদের মধ্য দিয়ে মানুষের নিকট প্রকটিত হয় ভাষায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কবিরাই পারেন সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গান গেয়ে তরুণ সমাজকে কালজয়ী কোনো সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে। তাই প্রাবন্ধিক মহাশয় কবিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। কেননা বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান অন্তরায় হলো ভাষা। বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা বিশ্বের খাদ্য সম্পদের অভাব সংকুলান করা গেলেও মানুষের মনকে সাধনার উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তার নেই। বিজ্ঞানীরা ভাষায় তেমন দক্ষ নয়।

কবিরা হলেন শাস্ত্রবাদী, স্বর্গীয় জগতে বিশ্বাসী, অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত মনোভাবসম্পন্ন, তারা বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মকরূপের সাথেই অধিক পরিচিত। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা ধর্মের গোঁড়া অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অন্তরের সত্তার উপাসনা করে গেছেন, প্রাণহীন মূর্তি পূজার বদলে প্রাণের পূজায় বিশ্বাসী, এরা যজ্ঞবেদীর বদলে গবেষণাগারকে করে তুলেছেন উপাসনার মন্দির।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রসারে লেখক চেয়েছেন কবিদের সাহায্য। কবিদের কলমে বিজ্ঞানের জয়গান ধ্বনিত হলে তা আরো বেশি গ্রহণীয় হবে। বিজ্ঞানের তুলনায় কাব্যের ভাষা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। মহান কবিদের মধ্যে একমাত্র গ্যেটেই বিজ্ঞানের সাধনায় বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। যদিও তখন ছিল বিজ্ঞানের যুগের শৈশবকাল, তবুও তাঁর রচনায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, বিজ্ঞানের আগ্রাসনকালে বিজ্ঞানী-প্রাবন্ধিক মেঘনাদ সাহা আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে অপরূপ মাতৃভাষায় সত্য, শিব ও সুন্দরের গান ধ্বনিত হলেও, হোমারের অনুকরণে প্রাচীন বীরের শৌর্য্য বর্ণিত হলেও, হিব্রু সত্যদর্শীদের মতো ভক্তিরস উদ্বেলিত হলেও, কিংবা কালিদাসের মতো শব্দ চয়নের মণিমালা নির্মিত হলেও, লোক সংগীতের সহজ সরল সুরে তাঁর বীণায় কখনো ঝংকৃত হয়নি বিজ্ঞান প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাষার উৎকর্ষতা চরম শিখরে পৌঁছেছে, কিন্তু লেখকের মধুর বাণী থেকে বিজ্ঞান থেকে গেছে শত যোজন দূরে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ অংশে লেখক তাই বিজ্ঞানীদের হয়ে কবির প্রতি অনুযোগ করে বলেছেন –

> "কবি তাঁহার অতুলনীয় শক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশে কখনও নিযুক্ত করেন নাই। এই দৃশ্যমান পৃথিবীর যে সামগ্রিক রূপ প্রাণীবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং ভৌত বিজ্ঞান উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠে আজও বাজে নাই। আমরা আশা করি তাঁহার প্রতিভাধর পূর্বপুরুষ গ্যেটের মত রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহার তুলনাহীন কাব্যে এই দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীর বর্তমান নৈরাশ্য ভেদ করিয়া মিলন, আশা ও আনন্দের বাণী সোচ্চার হইবে।"[৪]

মেঘনাথ সাহার এই অনুযোগের উত্তর দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, মেঘনাদ সাহাকে উৎসর্গীকৃৎ তাঁর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'বিজ্ঞান ও ধর্ম' প্রবন্ধে দেখা যায় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা মহাশয় মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্মকে অধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকারী বলে মনে করেছেন। কেননা ধর্মই পারে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে। ধর্মের মঙ্গলপথে মানুষ তার নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন সচেতন হবে তেমনি সমাজ-প্রকৃতিতেও প্রবাহিত হবে শুভ বার্তা। আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের দ্বারা মানবজীবনে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। বিভিন্ন জাতিকে করেছে নিকট, দেশকে করেছে নিকটতর। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে পারলেও, নিজের প্রকৃতিকে সে আয়ত্ত্বাধীন করতে পারেনি। বিজ্ঞানের যুগের পূর্বে প্রাকৃতিক নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে মানুষের অসহায় ভাব থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এর সাথে জীবন ও প্রকৃতির কোনো বৈজ্ঞানিক সংযোগ নেই বললেই চলে। লেখক প্রাচীন ধর্মজ্ঞানগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করে মানব জীবনে প্রয়োগ করতে বলেছেন। আবহাওয়ার ধর্ম যেমন গ্রীষ্ম, শীত, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র তেমনি মানব প্রকৃতির ধর্ম প্রেম, ঘৃণা, অনুরাগ-বিরাগ, দয়া, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি। এগুলি সময় বিশেষে অসুবিধার সৃষ্টি করলেও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়। বর্তমানে ধর্মসকল ঈশ্বরের উপাসনা পর্যন্তই কেবল সীমাবদ্ধ, এর কোন কল্যাণকর দিক সমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। বরং উল্টোটাই ঘটে। তাই লেখক ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে সার্বিক মঙ্গল কামনায় বলেছেন-

> "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধীত হইলে ধর্ম ক্রমে জ্ঞানের এমন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবে যাহা চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক কার্যকরী - কেননা ধর্ম মানুষের সত্তাকে শিখাইবে সমাজ ও প্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ।"[৫]

কর্মদ্যোগী মেঘনাথ সাহা সফলভাবে রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি'র সভাপতি হন। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনাগুলীর মধ্যে অন্যতম হলো 'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' - ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাটি যুগবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ১৫ই জানুয়ারি; 'রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প' রচনাটি ১৯৫৫ সালের ১৬ই এপ্রিল যুগবাণী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলেও এটি ১৯৫৫ সালের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪ঠা এপ্রিল লেখকের লোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা; 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি' রচনাটি চারুচন্দ্র ঘোষের সহযোগে লিখিত হয়ে যুগবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।

'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' কিংবা 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প' বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা তৎকালীন সময় প্রচলিত ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির অনেক ত্রুটিপূর্ণ দিক নিয়ে অবগত করেছেন। এই শিল্পনীতিতে বলা হয় অস্ত্রশস্ত্র, রেল, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি এই শ্রেণীর শিল্পসমূহ রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তবে বেসরকারি সংস্থাকেও নিরুৎসাহিত করা হবে না, মিশ্র অর্থনীতির ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই শিল্পোন্নয়নে অংশ নেবে, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল, কয়লা এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তৎকালীন সময়ে বিড়লা ব্রাদার্স ভারতে লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তাই শিল্পনীতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন-

> "আমাদের শিল্পনীতি আগাগোড়া বদলানো দরকার এবং টেকনিকাল লোক গভর্নমেন্টের নিজের হাতে থাকা দরকার। তাঁহাদের যে কোন বেতন আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র দেশের প্রতি দায়িত্বশীল থাকিতে হইবে, দেশ ছাড়া আর কাহারও স্বার্থ তাঁহারা দেখিতে পারিবেন না।"[৬]

মেঘনাথ সাহার 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি' প্রবন্ধটি মূলত দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গৃহহীন মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে লেখা। পূর্ববঙ্গ শরণার্থী সহায়তা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি উদবাস্তুদের জন্য জমি পুনর্বন্টনের প্রস্তাব দেন। তাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্থায়ী জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা সরকারকে তাদের উদ্বৃত্ত জমির তথ্য দিয়ে কেন্দ্র সরকারকে সাহায্য করতে বলেছেন। দেওয়া তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির বেশিরভাগই জলাভূমি, যেগুলি ভরাট করে পুনর্বাসনের বিলি ব্যবস্থা করা গেছে। আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে উদ্বৃত্ত জমি থাকা সত্ত্বেও আসামের পুনর্বাসন মন্ত্রী তা বিনামূল্যে দিতে নারাজ। ত্রিপুরায় যদিও জমির অভাব ছিল না। তাই সেখানে উদ্বাস্তু সেটলমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে। উড়িষ্যা ও বিহারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নমুখী, যেখানে তাদের নিজেদেরই কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যবাসী হতে হয় সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনুচিত বলে মনে করেছেন বিজ্ঞানী প্রাবন্ধিক মেঘনাদ সাহা। এমনকি রাজ্য পুনর্গঠন বিষয়েও তিনি লোকসভায় বারবার ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই বাংলা-বিহার এক করার প্রস্তাব উঠলে তিনি তার চরম বিরোধীতা করেন। কেননা, মাতৃভাষা ব্যবহার যেকোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, তা খর্ব করা গণতন্ত্র বিরোধী।

মেঘনাথ সাহা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির সাথেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা দেশকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে নানা কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উপরিউক্ত রচনাগুলির মধ্যে যেমন তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি সমর্পিতভাব প্রকাশ পেয়েছে তেমনই লক্ষিত হয়েছে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা এবং উদার মানবিকতাবোধ। সহজ সরল ভাষায় তাঁর জীবনের মূল আদর্শকে যেভাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাতে রচনাগুলি যেমন বাংলা ভাষায় লেখা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপর প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তেমনই বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বাংলা সাহিত্যের ভুবনে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ের সাহিত্যিকরূপে চিরস্থায়ী সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছেন।

Reference:

১. 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' - 'সাধনা ও সিদ্ধি', কুন্তলীন প্রেস, চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯২৭, পৃ. ২০২

২. চট্টোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'মেঘনাদ রচনা সংকলন' – 'একটি নূতন জীবন দর্শন', ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ১১৫

৩. তদেব, 'একটি নূতন জীবন দর্শন', পৃ. ১১৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. তদেব, 'কাব্য ও বিজ্ঞান', পৃ. ১০৮
৫. তদেব, 'বিজ্ঞান ও ধর্ম', পৃ. ১১২
৬. তদেব, 'ভারত সরকারের শিল্পনীতি', পৃ. ২৩০